মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জননী’
ত্রয়োদশতম পাঠ অভিজ্ঞতা

উম্মে রায়হানা

গোলাম মুরশিদের লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পড়ছিলাম। বইটির লেখনী ও তথ্যসমৃদ্ধ পরিবেশনের মতো এর নামটিও সুন্দর। ‘আশার ছলনে ভুলি’– মধুকবির জীবনের এক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির কথা বইয়ের শিরোনামে স্পষ্ট।

প্রথম অধ্যায়ে কবির ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষের ইতিহাস রয়েছে, যে ইতিহাস লেখা হয়েছে রীতিমতো গবেষণা করে; যেমন প্রথম পরিচ্ছেদেই পাই– “মধ্য বাংলার একটি সাধারণ গ্রামের একটি প্রথাবদ্ধ কিন্তু নব্যধনী পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছেন কলকাতায়। লেখাপড়া শিখেছেন হিন্দু কলেজে। ... তাঁর চরিত্রে এসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এলো কোত্থেকে? কতটা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে? ... তাঁর বাবা ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। জেঠা রাধামোহন যশোরের সেরেস্তাদার, মেজ জেঠা মদনমোহন কুমারখালির মুন্সেফ আর সেজ জেঠা যশোরের উকিল। ... ব্যক্তির চরিত্র গঠনে পরিবারের প্রভাব থাকে। ... যেজন্যে তাঁর জীবনী পুনর্গঠনে তাঁর পরিবার কেমন ছিল আর সেই পরিবারের আওতায় তিনি কিভাবে মানুষ হয়েছিলেন তা দেখা দরকার।”

কোনো কবি-লেখক-মনীষীকে জানতে হলে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। একথা কোনো নারীর জীবনী লিখতে হলেও একইরকমভাবে সত্য। রোকেয়া বা প্রীতিলতার জীবনী লিখতে চেয়ে কেউ যদি তাঁদের পিতা-পিতামহ এরকমভাবে না এগিয়ে মাতা-মাতামহী এভাবে এগোন, তাহলেও নিশ্চয়ই অনেকরকম চমকপ্রদ তথ্য ও ইতিহাস জানা যাবে।

ধরা যাক, রোকেয়ার জীবনীগ্রন্থ লেখা হচ্ছে। তাঁর জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে। রোকেয়ার মাতা হয়ত এখানে এসেছিলেন বৈবাহিক সূত্রে। তাঁর পরিবার ছিল অন্য কোথাও। সে দিকে কিন্তু আমরা এগোই না। পুরুষের মতন নারীর পারিবারিক ইতিহাসও লেখা হয় পিতার পরিবার দিয়েই। কেননা, মানুষের বংশগতির ইতিহাস পিতার রক্তেই প্রবাহিত হয়, মাতা কেবল গর্ভে ধারণ করেন মাত্র। ইতিহাসে তাঁর স্থান নেই। যে কারণে আমরা ‘পূর্বপুরুষ’ শব্দের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু ‘পূর্বনারী’ বলে কিছু হয় না।

নৃবিজ্ঞানে ‘পূর্বনারী’র ধারণা পাওয়া যায়। আদিম মানুষের ইতিহাস জানতে বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের

আদিমাতার খোঁজ পাবার কথা শুনেছি। কিন্তু তাতে মানুষের সামাজিক ইতিহাসে তেমন কোনো হেরফের হয় না।

মজার ব্যাপার হলো– যেহেতু 'পূর্বপুরুষ' সদা পুরুষবাচক, 'পূর্বপুরুষ'-এর মতো 'উত্তরাধিকার' শব্দেরও স্ত্রীবাচক হয় না। উত্তরাধিকার সবসময়ই পুরুষ। এমনকি নারীর ক্ষেত্রেও।

বাংলা ভাষায় অন্তত হাফ ডজন উপন্যাস, গল্প, নাটক, সিনেমা পাওয়া যাবে 'মা' অথবা 'জননী' নামে। বাংলা সাহিত্যে মায়ের রূপ কেমনভাবে আঁকা হয়েছে তার উপর গবেষণা অভিসন্দর্ভ হয়ত আরও বেশি পাওয়া যাবে। আমি কেবল একটি নিয়ে কিছু উপলব্ধিতে এসেছি, যা প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকেই এত কথার অবতারণা। সেই উপন্যাসটি হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী'।

সাহিত্যের মধ্যে পরিবেশনের রাজনীতি কীভাবে পুরুষাধিপত্যের পক্ষে কাজ করে সে সম্পর্কে critical দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে অনেক আগে। Kate Millet-এর Sexual Politics (১৯৬৯) পড়ে একে নিজের ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে খুব অসুবিধা হয় নি।

মিলেট তাঁর এই সাড়া জাগানো গবেষণা অভিসন্দর্ভে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করেছেন তা সম্ভবত এর শিরোনাম। লৈঙ্গিক রাজনীতির ধারণাকে তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কীভাবে নারীর ওপর পুরুষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়, নারীকে কেমন করে সর্বদা নিপীড়িত ও অধস্তন করে রাখে। তিনি তাঁর লেখায় এই পুরো প্রক্রিয়ার কিছু এলাকা ভাগ করে দেখিয়েছেন এই রাজনীতি কেমনভাবে কাজ করে। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়া ঘটে কয়েকটি ক্ষেত্রে– ভাবাদর্শগত, জৈবিক, সমাজতাত্ত্বিক, শ্রেণিগত, আর্থ ও শিক্ষাগত, বলপ্রয়োগ, নৃতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক।

মিলেট তাঁর গবেষণায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কেমন করে পুরুষ সাহিত্যিকের ধর্ষকামী মনোভাব নারীর অধস্তনতা ও অক্রিয়তাকে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় বা 'জায়েজ' করে তোলে।

কিন্তু 'জননী' উপন্যাসে মানিকের অসাধারণ 'পুরুষ'চোখ এবং কলমের প্রয়োগ বুঝতে এত বেশি সময় (তেরোবার পড়ার পর) কেন লাগল তার কারণ খুঁজেই পেলাম না।

মানিক মার্ক্স এবং ফ্রয়েড-এর তত্ত্ব দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন। এই উপন্যাসে মাতৃত্বের যে ছবি মানিক এঁকেছেন তার রূপ ফ্রয়েড-এর তত্ত্বের মতোই পুরুষাধিপত্যবাদী।

ফ্রয়েড-এর মতোই মানিকও ভেবেছেন যে, নারীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো অপ্রাপ্তি হচ্ছে একটি শিশ্নের অভাব এবং সেই অভাব পূরণ হয় কেবল পুত্রসন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে। মা হওয়াই যথেষ্ট নয়, পুত্রসন্তানের মা হলেই কেবল নারীর জীবনে পূর্ণতা আসতে পারে। নারীর উত্তরাধিকারও (সম্পত্তির নয়) হতে পারে কেবল পুরুষই। কেননা নারী একটি শিশ্নের অভাব বোধ করে তার জীবন কাটিয়ে দেয়। তার জননীরূপও এই অভাববোধের চেয়ে বেশি কিছুই নয়।

মানিকের 'জননী' উপন্যাসে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে স্পষ্টভাবে।

'জননী' উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্যামা নামের এক নারীর মাতৃত্বের কাহিনি– শ্যামার সন্তান ধারণে ব্যর্থতা, শ্যামার সন্তানের মৃত্যু, শ্যামার সন্তান জন্মদান, তাদের বড়ো করে তোলা এবং মা হিসেবে মানুষ শ্যামার ব্যক্তিগত লড়াই।

এই উপন্যাসে ইদিপাস কমপ্লেক্স ও ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স-এর মোহময় প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়; যেমন শ্যামার পুত্র বিধানের মায়ের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ এবং শ্যামার কন্যা বকুলের শ্যামার স্বামী শীতলের প্রতি অস্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব ('মোহময়' বিশেষণ প্রয়োগ করলাম এই জন্য যে, এই ধরনের আবেগ অনুভূতি সমাজে সর্বদা দেখা যায়, এবং খুব সম্ভবত ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব দিয়ে প্রভাবিত হয়েই এর সম্পর্কে এক ধরনের আহ্লাদীপনাও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ সুলভ।)

শ্যামার দীর্ঘ জীবনে দুটো কন্যাসন্তানও জন্মেছিল। শ্যামা তাদের প্রতি কোনো অবহেলা দেখিয়েছিলেন এমন দাবি করলে তা অন্যায় হবে। কিন্তু শ্যামা কি তাদের নিজের উত্তরাধিকার ভেবেছেন? শ্যামা কি হয়েছেন তাদের 'পূর্বনারী'?

শ্যামার কন্যাসন্তানদের একজন এসেছে অনেক পরে, শেষতম সন্তান অন্ধ মেয়েটি। তার সঙ্গে শ্যামার বা পাঠকের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু বকুলের আবির্ভাব উপন্যাসের শুরুর দিকে। তার সঙ্গে শ্যামার সম্পর্ক কেমন ছিল?

শ্যামা কি লক্ষ করেছিলেন বকুলের শিশু থেকে কন্যা হয়ে ওঠা? যেমনটা করেছিলেন বিধানের ক্ষেত্রে? তিনি কি দেখেছিলেন বকুলের কন্যা থেকে নারী আর নারী থেকে মা হয়ে ওঠা? শিশু বকুলের পিতার প্রতি অস্বাভাবিক ভালোবাসা শ্যামার হিংসার উদ্রেক করেছিল। তার জন্য স্বামী শীতলের শাস্তিও পেতে হয়েছিল তাকে। বকুলকে কিশোরীকালে চোখে চোখে রাখা ও বিয়ের পর তার স্বামীর প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়া– বকুল বিষয়ে শ্যামার অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। এ সমস্ত ছাড়া শ্যামার জীবনে বকুলকে নিয়ে খুব বেশি ভাবনাচিন্তা দেখা যায় নি।

বকুলের নবপরিণীত স্বামীর থেকে পাওয়া প্রেমপত্র শ্যামাকে নিজ কন্যার দাম্পত্য সম্পর্কে স্বস্তি দিলেও একটা অপ্রাপ্তি কিন্তু তিনি ঠিকই বোধ করছিলেন– শীতল কোনোদিন শ্যামাকে প্রেমপত্র লেখেন নি।

জীবনের এক পর্যায়ে মা-মেয়ের কাছাকাছি সময়ে গর্ভসঞ্চার হয়। নিজে গর্ভবতী অবস্থায় প্রৌঢ় বয়সে শ্যামা অবিশ্রান্ত সেবা করেন গর্ভবতী বকুলের। কিন্তু বকুলের মেয়ে কি শ্যামার উত্তরাধিকার হয়েছিল? শ্যামাকে কোনো পূর্ণতা এনে দিয়েছিল? দেয় নি। বরং অবাক হয়ে লক্ষ করতে হয় জননী শ্যামা নিজের মেয়ের অন্ধচোখ দেখে বকুলের কন্যার ডাগর চোখকে হিংসা করেছেন। ভেবেছেন তার মেয়ের চোখ অন্ধ বলেই বকুলের মেয়ের চোখ বুঝি অত ডাগর!

অথচ বিধানের ক্ষেত্রে উলটো অনুভূতি–

বিধানের স্ত্রীর যে যুবতীশরীর শ্যামাকে অজানা সর্বনাশের ভয়ে ভীত করেছিল, কান্নাভরা চোখে বারবার চেয়েও যে কোমলস্বভাবা তরুণী শ্যামার মন গলাতে পারে নি, যার প্রেমপত্রের উপস্থিতি

পুত্রের দাম্পত্য সম্পর্কে স্বস্তি তো দূরের কথা, দিয়েছিল একরাশ বিরক্তি– তার গর্ভসঞ্চারে শ্যামার মধ্যে ঘটে গিয়েছিল অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

অনাগত পৌত্র/পৌত্রীর আগমনের জন্যে দিন গুনে গুনে অপেক্ষা করেছিলেন আমাদের সর্বংসহা জননী শ্যামা। সেই সন্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছিল জীবনের চক্র।

সেই চক্র আসলে কার উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছিল পৃথিবীর বুকে? শ্যামার না শীতলের? সম্পত্তির প্রসঙ্গ যদি আসে তবে তা নিশ্চয়ই পুরুষেরই হবে। কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব তো সম্পত্তির সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। জননীর ক্ষেত্রে তো তা আরো বেশি সত্যি হবার কথা। কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করতে একই কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তবু এই সমাজে পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়– যার কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

কিন্তু বিধানের স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারে শ্যামা যে পূর্ণতার স্বাদ পান তা কেন বকুলের সময় হয় নি? শ্যামার উত্তরাধিকারের ধারণা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম নিজের অস্তিত্বকে বহমান রাখার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা কী করে পুত্রসন্তানের বীর্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, কন্যাসন্তানের গর্ভের মধ্য দিয়ে কেন হয় না?

এর একটা ব্যাখ্যাই হতে পারে, তা হচ্ছে : শ্যামা নয়, মানিকই শ্যামার হয়ে অনুভব করেছেন এই পূর্ণতা। মানিক নিজের 'পুরুষ' চোখ দিয়ে দেখেছেন এবং এঁকেছেন জীবনের চক্র পূর্ণ হওয়ার গল্প। কিন্তু তা আরোপ করেছেন শ্যামার ওপর, যে একজন নারী। সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করে শ্যামার এই একচক্ষু হরিণের মতো পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ পাঠকের কাছে মোটেও অস্বাভাবিক মনে হয় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত একটি চিঠিতে পূর্বপুরুষ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে সমীর কুমার ব্যানার্জী নামের এক প্রাবন্ধিককে একটি লেখা আরো বিশ্লেষণ করে লিখতে অনুরোধ করেন মানিক। তিনি বলেন, উক্ত লেখাটি তাঁদের অর্থাৎ সাহিত্যিকদের জন্য সহজবোধ্য হলেও সাধারণ মানুষের জন্য হবে না। এ প্রসঙ্গে মানিক লেখেন– "পিতার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাটি করা চলে– পিতারও অনেকরকম দোষ থাকে। কিন্তু পিতৃত্বকে যে অস্বীকার করতে চাইবে, যে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই– তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব, তাকে আমি ধিক্কার দেব। ... আমি কি জানি না পিতা ছাড়া ছেলে হয় না? ঐতিহ্য ছাড়া কৃষ্টি হয় না?"

এই উক্তি থেকে সম্ভবত ব্যক্তি মানিকের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের ধারণা পাওয়া যায়।

মানুষের বংশগতিতে, ঐতিহ্যে, ইতিহাসে কেবলি পুরুষ, পুরুষ এবং পুরুষ। নারীর স্থান কোথাও নেই। নারী প্রজননক্রিয়াটি ঘটায়, সন্তান ধারণের আধার হয় বলে সে জননী মাত্র– তার চেয়ে বেশি কিছুই সে নয়।

জননীর সর্বংসহা, নিপীড়িত, ধরিত্রীর মতো আগলে রাখা চরিত্র– যা সব এতদিন ধরে সাহিত্যের পাতায় পাতায় আঁকা হয়ে এসেছে তার থেকে মানিকের জননী কোনোদিক থেকেই আলাদা নয়।

নারীর মাতৃত্বের মহিমা যেমন সমাজে পুরুষের দেওয়া বৈধতার ওপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি সাহিত্যে নারীর মনস্তত্ত্ব নির্ভর করে পুরুষ লেখকের দেওয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর। পুরুষাধিপত্যবাদী সবরকম ধারণা যুগে যুগে ধর্মের নামে চাপিয়ে দেওয়া হতো। ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পর তা করা হয় বিজ্ঞানের নামে। মানিকের জননী এই প্রক্রিয়ার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণমাত্র।

কোথাও কোথাও তেরোকে 'অপয়া' সংখ্যা বলে মনে করা হয়। গতবার তেরো বছরে সবচেয়ে বেশিবার পড়া, সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাসের এই ব্যাখ্যা মনে আসায় কথাটাকে সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

উম্মে রায়হানা গণমাধ্যমকর্মী। ummerayhana@gmail.com

তথ্যসূত্র

- আশার ছলনে ভুলি, গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৯৫
- অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, দেজ পাবলিসিং, কোলকাতা, ১৯৭৬
- নারী, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
- Sexual Politics, Kate Millett, 1969.
  ressourcesfeministes.files.wordpress.com/2012/08/sexual-politics.pdf